গান-বিজ্ঞানের কথা

পুরব পাল

অনুষ্টুপ

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩

সংকেত ১৯

- সুরে সুর মেলাতে বেলা যে যায় ২১
- বারো নিয়ে বাড়াবাড়ি ৩২
- আরো বারো ৪৪
- আইন কানুন সর্বনেশে ৫৭
- ‘পা’-এ ধ’রে সাধা ৬৬
- আগা-মাথা ৭৬
- ভালো-মন্দ ৮৯
- গানের ভুবন ভরিয়ে দেওয়া ১০৮
- ঢেউ গোনা ১১৮
- এ গান শোনাবো হাওয়ায় হাওয়ায় ১৩১
- তোমার সুর হলো গিয়ে তোমার কানে ১৪৬
- ইলেক্‌ট্রনিক বাজনাগোলার হট্টগোলে ১৫৪
- মিলবো কী শর্তে? ১৬৬
- পরশমনি ছোঁয়াও কানে ১৮১

তালিকা ১৯৪

তথ্যসূত্র ১৯৯

বর্নক্রমিক সূচি ২০২

ভূমিকা

এই বই সঙ্গীত এবং বিজ্ঞান বিষয়ক ১৪টি প্রবন্ধের সংকলন। প্রতিটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে গানবাজনা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে — যেরকম প্রশ্ন আমাদের অনেকের মনেই মাঝেমধ্যে উদয় হয়। 'একটা সপ্তকের মধ্যে মোট বারোটা সুর হয় কেন', 'গিটারের তারগুলো নানান রকমের সরু-মোটা হয় কেন', 'একটা পাইপের মধ্যে ফুঁ দিয়েই যখন আওয়াজ তৈরি হয় তখন এতোরকমের বাঁশির আওয়াজ কী ক'রে তৈরি হয়', 'পিয়ানোর প্রথম পর্দার নাম C হয় কেন', 'সিন্থেসাইজারের মতো যন্ত্র থেকে কী ক'রে নানারকম বাজনার আওয়াজ বেরোয়', ইত্যাদি। কিছু প্রশ্ন হয়তো নতুন ঠেকতে পারে, যেমন 'একটা পিয়ানোকে ঠিক ঠিক সুরে বাঁধা সম্ভব নয় কেন', 'ঠিক সুর কথাটারই বা মানে কী', 'পিয়ানোর পর্দাগুলোর সর্বজনস্বীকৃত কম্পাঙ্ক বা পিচ কী ক'রে ধার্য হলো', ইত্যাদি। এইরকম এক বা একাধিক প্রশ্নের আলোচনা করা হয়েছে প্রতিটা প্রবন্ধে। প্রবন্ধগুলো পড়ার সময়ে এই বইয়ে সাজিয়ে দেওয়া ক্রম অনুসারে পড়াই বাঞ্ছনীয় — যেহেতু বেশিরভাগ লেখাতেই আগের লেখার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

বইয়ের নামের মধ্যে প্রয়োগ করা তিনটে শব্দের মধ্যে একটা শব্দ একটু ধোঁয়াটে — সুতরাং সেই শব্দটা দিয়ে লেখক হিশেবে আমি কী বোঝাতে চাইছি সেটা ব'লে রাখা দরকার। শুরুর আর শেষের শব্দদুটোর মানে নিয়ে কোনো বাঙালী পাঠকের মনেই কোনো সংশয় হবে না, কিন্তু মাঝের কথাটা, অর্থাৎ 'বিজ্ঞান' বলতে আমরা নানা লোকে নানারকম কথা বুঝি। কারোর কাছে বিজ্ঞানের অর্থ ডাকসাইটে প্রযুক্তি, কারোর কাছে নিরস নিরেট যুক্তি, কারোর কাছে হয়তো ভয়ংকর দেখতে সব দুর্বোধ্য দাঁতভাঙা

ফর্মুলার মহাসম্মেলন। আসলে এই সমস্তকিছুর উর্ধে, 'বিজ্ঞান' হলো প্রকৃতির নানান ঘটনার মধ্যে একটা কার্যকারন সম্পর্ক স্থাপন করার প্রচেষ্টা। নদীতে জোয়ার আসে, সূর্যে গ্রহন লাগে, দুধ ট'কে গেলে দই হয়, ঠান্ডা জিনিশ খেলে আমাদের মাথাব্যথা করে — এই সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার কারন অনুসন্ধান এবং ব্যাখ্যা করাই হলো বিজ্ঞানের কাজ। এই বইয়ের ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান' কথাটার এই মানেটাই ধরতে হবে। এই কাজে প্রয়োজন হয় যুক্তির, সেই যুক্তির নানান রূপ হিশেবে আসে সংখ্যা, সংকেত, সমীকরন ইত্যাদি। সুতরাং প্রয়োজন মতো তাদের ব্যবহার করা হয়েছে। আর বেশিরভাগ লেখাতেই বহু ব্যবহৃত হয়েছে 'নৈসর্গিক', 'প্রাকৃতিক' এইসব কথা। বিজ্ঞান বলতে এখানে কীসের কথা বলা হচ্ছে, এই লক্ষনটাই তার সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী।

যুক্তিপ্রয়োগের ধারা হিশেবে এই কাজে কিছু সংকেত, সমীকরন ইত্যাদির ব্যবহার করা হলেও প্রায় কোনো আলোচনাতেই এমন কোনো কথা বলা হয়নি যা ইশকুলে দশম শ্রেনীর সিলেবাসের বাইরে পড়ে। যে দু-একটা জায়গায় এই সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে, তা সহজ ক'রে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং, সংখ্যা অথবা যুক্তি দেখামাত্রই দাঁতকপাটি না লাগলে এই বইয়ে করা আলোচনা খুব দুর্বোধ্য ঠেকার কথা নয়।

★ — ○ — ★

এই বইতে ব্যবহার হওয়া কিছু বানান নিয়ে পাঠকের মনে ধন্দ তৈরি হতে পারে। তার কৈফিয়ৎ দিয়ে নেবার একটা দায় থেকেই যায়। এ বই বাংলা ব্যকরনের বই নয়। সে কারনে বিশদে না লিখে যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই কৈফিয়ৎ লিখে রাখছি।

যে কোনো ভাষা অনেক অনেক লোক বলেন, তার চেয়ে অনেক কম লোক পড়েন, তার চেয়েও অনেক কম লোক লেখেন। সুতরাং যাঁরা লিখছেন, তাঁদের দায় থেকে যায় কীভাবে ভাষাটা বলা হচ্ছে সেটা লিপিবদ্ধ করার। অর্থাৎ, লেখা হওয়া উচিৎ উচ্চারন অনুসারী।

"বানানটা ব্যবহারের জিনিস, শব্দতত্ত্বের নয়। পুরাতত্ত্বের বোঝা মিউজিয়ম বহন করিতে পারে, হাটে বাজারে তাহাকে যথাসাধ্য বর্জন করিতে হয়।"[১]

---

[১] "বাংলা বানান", বাংলা শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই কারনে আমি বাংলা বানানে যথাসম্ভব মুর্ধন্য ণ বর্জনের পক্ষপাতী, যেহেতু বাংলায় মূর্ধন্য ণ-এর কোনো উচ্চারন নেই। এই না থাকাটা আরো প্রকট হয়, কারন অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এই উচ্চারন আছে। 'জনগণমন অধিনায়ক' গাইবার সময়ে বাঙালি আর অবাঙালি কন্ঠে যেভাবে ঐ প্রথম শব্দের 'গণ' অংশটা উচ্চারিত হয় তাতেই এই তফাতটা বোঝা যায়। বাংলায় এই উচ্চারনটা নেই। সুতরাং এই বর্নটা আলাদা ক'রে দেখানোর কোনো মানে নেই। একটু আগে যে প্রবন্ধের উল্লেখ করেছি, সেখানেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "... লিখিবার বেলায় আমরা নুন লিখি, পন্ডিতই জানেন উহার মূল শব্দে একটা মূর্ধণ্য ণ ছিলো। ... যেখানে বাংলা শব্দ সেখানেও সংস্কৃতের শাসন যদি টানিয়া আনি, তবে রাস্তায় যে পুলিস আছে ঘরের ব্যবস্থার জন্যও তাহার গুঁতা ডাকিয়া আনার মতো হয়। সংস্কৃতে কর্ণ লিখিবার বেলা মূর্ধন্য ণ ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য, কিন্তু কান লিখিবার বেলাও যদি সংস্কৃত অভিধানের কানমলা খাইতে হয় তবে এ পীড়ন সহিবে কেন?"

কেউ অবাক হয়ে ভাবতে পারেন তাহলে আমি 'কর্ন' লিখেছি কেন! তার কারন উপরের লেখাটি রবীন্দ্রনাথ লেখার পরে প্রায় ৯০ বছর কেটে গেছে। আমার সবিনয় প্রস্তাব, এতোদিনে আমাদের কর্ন, বর্ন ইত্যাদি শব্দকে বাংলা শব্দ ব'লে মেনে নেওয়া উচিৎ। বাজার, জবরদস্ত ইত্যাদি লেখার সময়ে যখন আমাদের ফাসী z উচ্চারনের ইতিহাস দেখাই না, বা আপেল, টেবিল ইত্যাদি লেখার সময়ে ইংরেজি 'প্ল', 'ব্ল' ইত্যাদি পদানুর ৯-কার স্বরধনির উচ্চারন দেখাবার চেষ্টা করি না — তখন 'কর্ন', 'বর্ন' ইত্যাদি লেখার সময়ে অন্য কোনো নিয়মের কারন দেখি না। রবীন্দ্রনাথের বাংলা শব্দতত্ত্বের অন্যান্য লেখা পড়লেই দেখা যায়, কথায় কথায় সংস্কৃতের এই চোখ রাঙানি তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না।

উচ্চারন অনুসারী হবার সূত্র ধরেই পরের দুটো বদোলের কথা সেরে নেওয়া যাক। বাংলায় পরিস্কার 'অ্যা' স্বরধনি আছে অথচ তার জন্য কোনো চিহ্ন বরাদ্দ নেই। "এইবেলা একটা খেলা দেখুন" কথাটা লেখার আর পড়ার সময়ে যে অযথা দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যাকে মজা ক'রে বলতেন 'ভাসুর-ভাদ্র বৌয়ের মধ্যে একটা অকারণ পর্দার দূরত্ব' — সেটা কাটানোর জন্য 'অ্যা' ধনি বোঝাতে 'পেটকাটা এ' আর 'পেটকাটা এ-কার' ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, একটু আগে লেখা বাক্যটা লেখা হয়েছে "এইবেলা